*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 7-14*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8**

# সৈয়দ শামসুল হকের ছোটগল্প: সমাজের ক্যানভাসে আঁকা বৈচিত্র্যময় স্কেচ

**ফারজানা রুমা**
*এম.ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ*

***Abstract:***

*Literature speaks of society, it speaks of people. Because a writer is the most emotional person in the society. Therefore, any special emotion, crisis, conflict in the life of the society, country, people makes the writer think. All great works of literature are created from that thought. Similarly, Syed Shamsul Haque as a writer has explored various aspects of modern life reality in his short stories such as various crises of society, isolation, middle class, emotional feelings of the common people, poverty, superstition, mental turmoil, fluctuations of hope and despair. In his short stories, the author depicts the reality of the obstacles that the subtle events of the society create in the way of individual life. Because short stories are the special medium of expression in literature where fragmentary images of social life are presented in terms of reality. Syed Shamsul Haque is a unique genius in drawing this picture.*

আধুনিক পৃথিবীতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জনিত সঙ্কটে সংশয়ে দীর্ণ ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণা জন্ম দিয়েছে ছোটগল্পের । অখন্ড জীবন বোধ যখন হারিয়ে গেছে তখন আর উপন্যাস নয়, ছোটগল্প এসেছে তার সংক্ষিপ্ত অবয়ব নিয়ে সমাজ ও যুগ সম্পর্কে খন্ড মানুষের এই যুগ চেতনাকে সংহত ছোটগল্প ছাড়া আর কোন সাহিত্য মাধ্যমেই বোধ হয় যথার্থ শিল্পরূপ দিতে পারত না। ঔপনিবেশিক শাসনের এক বিশেষ পর্যায়ে বাংলার পল্লীগ্রাম যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করে এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রভাবে বাংলায় দেখা দেয় যে নবতর জীবনবোধ, বস্তুত এই দ্বৈত প্রবণতাই সম্ভব হয়েছিল ছোটগল্পের মত ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ তাৎপর্যময় শিল্প আঙ্গিকের উদ্ভাবন। এরই ধারাবাহিকতায় পঞ্চাশের দশকে সমাজ জীবন যখন অর্থনৈতিক  সংকটের সম্মুখীন, তখন জনমানস ক্রমশ নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল একদিকে অনগ্রসরতা ও রক্ষণশীলতা অন্যদিকে প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির পুনরুজ্জীবন। এই সমস্ত দ্বন্দ্ব আলোড়নের মধ্যেই সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) সচেতন শিল্পীমন আত্মপ্রকাশের জন্য প্রতিক্ষীত ছিল। তিনি নিরীক্ষার দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন উপরোক্ত সংকট, নৈরাজ্য ও উদ্দীপনাকে। তাঁর গল্পের শৈলীতে, বিষয়বৈভবে তাই এসেছে ভিন্নতর সৃজন, যাতে আছে অনিবার্য শিল্পকুশলতা। ছোটগল্পে যদিও যাপিত জীবনের সামগ্রিক চিত্রায়ন প্রত্যাশিত থাকে না তবুও জীবনের যে নির্বাচিত খন্ডচিত্রগুলি এতে বিধৃত থাকে তাতেই জীবনবোধের, অনুভবের, বিশ্বাসের, স্বপ্নের, দুঃস্বপ্নের, অতিপ্রাকৃতের, আত্মগত তৃপ্তির, মানবিকতার, অস্তিত্বের ভারে বিঘোষিত থাকে। সৈয়দ শামসুল হক ছোটগল্পের মাধ্যমে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক

জীবনের নানাবিধ সমস্যা সংকট তুলে ধরেছেন। ফলে তার গল্পগুলি হয়ে উঠেছে আমাদর জীবনের বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

পঞ্চাশের দশকের কয়েকজন গল্পকার তাঁদের সময়ের লেখকদের থেকে ভিন্ন মেজাজে নিজস্ব স্বকীয়তায় ছোটগল্প লিখেছেন। বস্তুত, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের লেখকদের একটি অংশ একই রকম চিন্তাধারা ও প্রকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁদের অধিকাংশের গল্পে কলকাতাকেন্দ্রিক নগর জীবন বাস্তবতা মূর্ত হতে দেখা যায়। সৈয়দ হক ছিলেন এক্ষেত্রে স্বতন্ত্রধারার গল্পকার। কেননা তাঁর গল্পে ঢাকাকেন্দ্রিক বিকাশশীল মধ্যবিত্তের আত্মিক সংকট বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, দারিদ্রতা, অসাম্প্রদায়িকতা,ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা , প্রত্যাশাবিহীন মানুষ ইত্যাদি অনুষঙ্গ ঘুরে ফিরে বার বার গল্পে স্থান পেয়েছে। মূলত সৈয়দ শামসুল হক ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে বাবার সাথে থাকতেন। সে সময় ঢাকা ছিল মফস্বল শহরের মত। পাকিস্তানি শাসনাধীন ঢাকাকেন্দ্রিক নগরজীবনের নানাবিধ জটিলতা, নগর ও গ্রামীণ মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক সংকটকে গভীরভাবে তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর 'তাস', 'শীত বিকেল', 'ফিরে আসা', 'আনন্দের মৃত্যু', 'পূর্ণিমার কেনাবেচা', 'মানুষ' ইত্যাদি গল্পে আমরা মানব জীবনের বহু বর্ণিল আলোর সন্ধান পাই।

অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষের জীবন যাপন নিয়ন্ত্রন করে। আর তাই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি গড়ে উঠেছে যুগে যুগে। এই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা মানুষের সুখ দুঃখের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তেমনি এক অস্বচ্ছল পরিবারের আশা-নৈরাশ্য, সুখ-দুঃখের গল্প 'শীত বিকেল'। বাংলাদেশের সামগ্রিক জীবনাচরণ, মানুষের অন্তর্লীন জগতের পরিচয় প্রস্ফূটিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের এ গল্পটিতে। এ গল্পটি আবর্তিত হয়েছে আনু নামের এক বালককে কেন্দ্র করে। তার পিতা দারোগা। সামান্য বেতনে পাঁচ ছয়জন সদস্যের খাওয়া-পরার সংস্থান করতে হিমশিম খেতে হয়। এ গল্পে আমরা বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে অর্থনৈতিক ও মানবিক সংকট তা ছোট্ট বালক আনুর উপলব্ধিতে দেখতে পাই। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি তাকে শিউলি ফুল কুড়োতে যেতে। শিউলি ফুলের বোটার রং দিয়ে মা জরদা করবে সেই লোভে। কিন্তু বালক আনু জানে না যে তার মা চাইলেই জরদা রেধে খাওয়াতে পারেন না। তাদের ডাল ভাত খাবার অর্থ সংগ্রহ করাই কষ্টের সেখানে জরদা অনেকটা বিলাসীতাই বলা চলে। তাদের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা ফুটে উঠেছে আনু ও মায়ের কথোপোকথনে-

আমি পানি চাইতে মা বললেন,.....ধন্যি ছেলে, নিত্যি নিত্যি ফুল কুড়োনো চাই-ই চাই। কী হয় এত এনে?
..... কেন, সালু আপাই তো বলেছে শিউলির বোঁটা দিয়ে রঙ হয়। সেই রঙে তুমি নাকি জরদা করবে।
মা-র দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একটু চুপ করে থেকে তিনি পানি তুলে দিলেন। মা যে কেন চুপ করলেন বুঝতে পারলাম না।[১]

সন্তানকে সামান্য জরদা তৈরি করে খাওয়াতে না পারার যে দুঃখ তা আনু না বুঝতে পারলেও তা বাংলার আপামর সাধারণ ছা-পোষা মানুষের সকলের দুঃখ বলে মনে হয়। তার মায়ের দীর্ঘশ্বাসও মধ্যবিত্ত বাঙালীর ধুকে ধুকে বেঁচে থাকার দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়। 'শীত বিকেল' গল্পটিতে লেখক দারিদ্যের কাছে নৈতিক মূল্যবোধের অবস্থলনও দেখিয়েছেন। আনুর বড় ভাই রেলের চাকরি পাবার পর তারা সবাই যে স্বচ্ছল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল তা অচিরেই শেষ হয়ে যায় তার ভাইয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তখন তার বাবা আনুর মধ্য দিয়ে অভাব কাটিয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা করেন। আর তা সফল করতে আনুকে ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে চান। কিন্তু তার পক্ষে সংসার খরচের পাশাপাশি বাড়তি কোনো খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব। আর তাই তাকে বেছে নিতে হয় অসৎ পথ। এই যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আমরা আমাদের সমাজে প্রায়শ প্রত্যক্ষ করি এ গল্পটি যেন তারই বাস্তব প্রতিকৃতি-

বাবার কপালে ফোটা ফোটা ঘাম। ঠোটদুটো যেন কাঁপছে।....ঠিক তার পরদিনই বিকেলবেলায় মাস্টার সাহেব থানা থেকে এসে গভীর উদ্বেগ আর শঙ্কাভরা গলায় বলেন.....থানায় খবর এসেছে। দারোগা সাহেব অ্যারেস্ট হয়েছেন....বড় দারোগা সাহেব চার হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছেন।[২]

মূলত একজন নিষ্পাপ, নির্মল সরল হৃদয়ের শিশু আনু, যে তার পরিবারের মল্যবোধগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছে, উপলব্ধি করেছে সংসারের উত্থান-পতন, আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ- বেদনা, গৌরব ও লজ্জা। এসব কিছু দেখে দেখে তার মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে তা তাকে জীবনভর পরিচালিত করবে। আনুর এই যে উপলব্ধি এ গল্পটি পাঠ করতে গিয়ে প্রত্যেক পাঠকের মধ্যে যেন তার শৈশব জীবনের প্রতিটি বোধের জাগরণের সেই স্বপ্নময় দিনগুলির স্মৃতি ভেসে ওঠে।

মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি মানবিক সংকট ও সৈয়দ শামসুল হক গভীরভাবে সনাক্ত করতে পেরেছেন। তাঁর 'তাস' গল্পটিতে তা উপযুক্ত পটভূমিতে উপস্থাপন করেছেন। খোকন, বিধবা বোন সালেহা, বিধবা মা এই তিন চরিত্রের ত্রিমাত্রিক সংকট মা-র অন্তরের গহীনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা অপূর্ব ভাষাচিত্র পেয়েছে এ গল্পে। এ গল্পে এক বিধবা মায়ের স্বামীর কালের এক পুরানো ঘড়ির প্রতি মায়ের অপরীসীম যত্ন ও আবেগ মায়ের মনে দ্বিধান্বিত সত্তার জন্ম দিয়েছে। ঘড়িটি স্বামীর স্মৃতি, স্বামীর পরশ অনুভব করে বিধবা মা তাকে জীবনের মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করে। প্রয়াত স্বামীর স্মৃতির প্রতীক। ঘড়িটির প্রতি ছেলের অবহেলা পক্ষান্তরে ঘড়ি না মেরামত করতে দিয়ে তাস কিনে ঘরে ফেরাকে মা সহজভাবে নিতে পারে না। ঘড়িটির প্রতি অবজ্ঞা ও তাস কেনাকে যেন স্বামীহীন জীবনের যন্ত্রণা ও মনোকষ্টের প্রতীকরূপে দেখিয়েছেন। তাই গোপনে মা খোকার ঘরে ঢুকে তাস ছিড়ে ফেলতে সিদ্ধান্ত নিয়েও ছিড়তে পারেন না। তার খোকার শিশুকালের মুখটি যেন মায়ের চোখে ভেসে ওঠে। তখন মায়ের মনের সব ক্ষোভ, অভিমান কেটে কেবল মাতৃহৃদয়ের স্নেহ প্রকাশ পায়। এই যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এই যে মানুষের মানসিক অস্থিরতা তা সৈয়দ শামসুল হক কুশলী শিল্পীর মত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'তাস' গল্পে স্মৃতিকাতর হৃদয়ে কখনো মায়ের মনে হয়েছে-
স্বামীর স্পর্শ যেন এখনও লেগে রয়েছে ঘড়িটির গায়ে।[৩]

কখনো মা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে তাসটি ছিড়ে ফেলতে চেয়েছেন কিন্তু-

ভয়, দ্বিধা আর সংকোচ। তবুও দুহাতে তাসের প্যাকেটটা তুলে নিলেন।..... ইচ্ছে হল তাসগুলো কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেলেন।.....সহসা ঘুমন্ত খোকন পাশ ফিরে মায়ের দিকে মুখ করল।.... খোকনের মুখখানা কী সুন্দর আর কেমন মিঠে! মা দেখেন আর দেখেন।[৪]

স্মৃতিকাতরতা স্বামীর প্রতি, অন্তহীন ভালোবাসা, মাতৃস্নেহ সেই সাথে মধ্যবিত্ত জীবনাচরণ এক বিধবা মায়ের মানবিক যে সংকট সৃষ্টি করেছে 'তাস' গল্পটি যেন তারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের যে-চিত্র তার বড় একটা অংশ জুড়ে আছে নাগরিক জীবন। নাগরিক জীবনের বিচিত্র ঘটনাপরম্পরা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মনোদৈহিক সম্পর্কজনিত জটিলতা, একাকীত্ব, বিকার তথা মধ্যবিত্ত জীবনের নানামাত্রিক জটিলতা তাঁর গল্পের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। তেমনি নাগরিক জীবনের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের গল্প 'ফিরে আসে' মানব হৃদয়ের অলিগলি চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে সময়কে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে লেখক উপস্থাপন করেছেন এ গল্পে। পঞ্চাশের দশকের সেই অস্থির সময়ে যে সময় কেবলি বিপন্ন ও আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের সময়। এ গল্পে দেখেছি কবি লিখতে না পারার কষ্ট পাচ্ছে। শিল্পী পাচ্ছে আঁকতে না পারার কষ্ট। এই যে না পারার সমাহার তা মূলত ভবিষ্যৎহীন নাগরিক জীবনের হতাশা আর অবসাদ থেকে উদ্ভূত। যা আমরা আজও আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ করি।

এখন আমি কিছুই লিখতে পারব না। এখন তায়মুর কোনও ছবিই আঁকতে পারবে না। এখন একজন আব্দুল্লাহ লিখতে না পেরে বিদেশে চলে যাবে। কারণ আমাদের কিছুই নেই পেছনে, কিছুই নেই সামনে। .....এ হচ্ছে এমন একটা সময় আমরা কিছুই করতে পারব না...।[৫]

এ গল্পে প্রেম এসেছে ভিন্ন আঙ্গিকে যেখানে সৈয়দ হক বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে তুলে এনেছেন প্রেমের অনুষঙ্গে। বিনষ্ট সময়, অস্থির সামাজিক পরিবেশে প্রেম যে বিপন্ন তা তিনি দেখিয়েছেন। এ গল্পে তিনি দু'জন যুবক দু'জন মেয়ের পারস্পারিক ভালোবাসাকে সামনে রেখে তাদের মনস্তাত্বিক সমস্যাকে চিহ্নিত করছেন গভীরভাবে। কেন্দ্রীয় চরিত্র বা গল্পকথক রানাকে ভালোবাসে তবে রানার নিরুত্তাপ ও অস্পষ্ট ভালোবাসা তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে তায়মুর ভালোবাসে এমিলিকে। অস্থির অসহ্য সামাজিক বাস্তবতা সদর্থক ও শিল্পিত বোধকে যখন ধীরে ধীরে গ্রাস করে, তখন নারীর প্রেম-সাহচর্য তাদেরকে খানিকটা বাঁচিয়ে তোলে। তাই সম্পূর্ণ প্রেমের গল্প এটাকে বলা চলে না। 'বরং জীবনের শিল্পের গভীর সংকটকে সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে তুলে এনেছেন গল্পকার-প্রেম সেখানে একটা আশ্রয়'[৬]।

বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত, স্বপ্ন ও প্রত্যাশাহীন বিপন্ন মানবজীবনের এক অসাধারণ প্রতীক চিত্রায়ন 'আনন্দের মৃত্যু' গল্পটি। এ গল্পে আমরা দু'টি নাগরিক চরিত্রের সন্ধান পাই যাদের জীবনে কোনো বিশেষ স্মৃতি নেই। স্বপ্ন নেই, আশা নেই, আনন্দ নেই। জীবনের একঘেয়েমি প্রবাহে যারা ক্লান্ত। তাই বার-রেস্তোরায় তাদের জীবন কাটে একটুখানি ভুলে থাকার আনন্দের খোঁজে। যাদের পৃথিবীর কোনো বিষয়ে একমত নেই কেবল একটি বিষয় ছাড়া সেটা হচ্ছে একজন মদ্যপ ব্যক্তি তার মদ পান করে উঠে যাবার দৃশ্যটি তাদের কাছে পৃথিবীর একমাত্র আনন্দের বস্তু বলে মনে হয়। তারা উভয়ই এ দৃশ্যটির প্রেমে পড়ে যায়। এবং কেবল ঐ একটি দৃশ্য দেখবে বলে তারা উন্মুখ-প্রত্যাশায় বারে আসতে থাকে। তাদের এই যে মনস্তাত্বিক একতা প্রকৃতপক্ষে নাগরিক মানুষের ফাঁপা সম্পর্কের আভাস দেয়, পারস্পারিক বিচ্ছিন্নতাবোধকেই তীব্রভাবে মূর্ত করে তোলে। এই যে অস্বাভাবিক আনন্দ তা মূলত মানুষের মানসিক অসুস্থতাকে ইঙ্গিত করে-

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন লোকটি যেন তাদের ডাকে, এই পানশালায় তাদের টেনে আনে। লোকটি যখন বাড়ি ফিরে যায় তখন তারা উঠে আসে। তখন তাদের মনের মধ্যে আনন্দ, সুখ ভরে ওঠে। এরকম আশ্চর্য আমোদ তারা আর কখনও বোধ করেনি; এরকম নির্ভার আর কখনো মনে হয়নি।[৭]

গল্পের একদম শেষাংশে আমরা দেখি তাদের আনন্দের একমাত্র উপকরণের মৃত্যু। আর তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেন তাদের জীবন নিরানন্দময় অসীম শূন্যতায় পর্যবসিত হয় যেখানে কেবলই অর্থহীন শূন্যতা-

বেরিয়ে এসে তারা অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না তাদের গন্তব্য কোথায়।.....দুজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বহুক্ষণ ধরে এই বলাবলি করল যে, কিছুই কিছুই না, আর সেই-যে কিছু না তা-ও কিছু না।[৮]

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের কাছে মানুষ তুচ্ছ ক্ষুদ্র যেন বিধাতার হাতের পুতুল। তিনি যেমনি করে খেলতে চান তেমনি আমরা খেলছি। এই চিরন্তন সত্যের বাণী বাস্তবরূপ লাভ করেছে সৈয়দ শামসুল হকের 'কালামাঝি চড়নদার' গল্পে। এ গল্পে সফেদ মল্লিক তার মৃত্যু পথযাত্রী পিতাকে দেখতে কালামাঝির নৌকা ভাড়া করে। কিন্তু ঝড়ো মেঘ দেখে মাঝি নৌকা ছাড়ে না। ঝড় আসার অপেক্ষায় থেকে ঝড় কিছুটা কমলে তারা রওনা হয় কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মাঝ নদীতে তীব্র ঝড়ে সফেদ মল্লিক মারা যায় এবং তার বাবা মধ্য রাত থেকে সুস্থ হয়ে যায়। এই যে শয্যাগত মুমূর্ষ মানুষের সুস্থতা ও সুস্থ মানুষের হঠাৎ প্রয়ান আমাদের নশ্বর জগতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন কিছুই যে নিশ্চিত নয়, স্থায়ী নয় একজন অদৃশ্য কেউ যে এ জগত নিয়ে খেলছে এটি তারই চমৎকার উদাহারণ-

.....তুফান জোর ধরছিল মাইঝ গাঙ্গে। বাপেরে থুইয়া ব্যাটাক নিছে আল্লাহ।.....শ্যাষ রাইতে তার বিমার কইমা গেছে.....।[৯]

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কবলে জর্জরিত। যে বিপুল ঐশ্বর্য বাংলায় ছিল তা শুষে নিঃশেষ করে দিয়েছে- দিচ্ছে এই সামাজ্যবাদের করাল গ্রাস। আর তাই নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা পরাধীনতার

গ্লানি মাথায় নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' গল্পটি এই নিদারুন বাস্তবতার প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে দূর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার ছবি। ক্ষুধার যন্ত্রনায় কাতর মূর্ছাপ্রায় একজন ব্যক্তির সামনে ইদ্রিস খাঁ নামক এক ব্যক্তি এসে রুপার পাত্রে পানি দেয়। যে ব্যক্তিটি অন্যের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু ভোলা মাস্টার তাকে বুদ্ধি দিয়ে সেই পরাধীনতা থেকে মুক্তির পথ বাতলে দেয়। এই যে ইদ্রিস খাঁ, ভোলা মাস্টার, রুপার গেলাস এগুলো প্রত্যেকটি এক একটি প্রতীকরূপে আমাদের চেতনায় আঘাত করে। রূপার গেলাসটি বাঙলার সমৃদ্ধশালী অতীত ঐতিহ্যের কথা, ইদ্রিস খাঁর অবস্থা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালীর কথা, একইভাবে ভোলা মাষ্টার আমাদের বন্ধনমুক্তির কান্ডারী রূপে প্রতীয়মান হতে দেখা যায় এ গল্পে। তবে এই যে অশুভ শক্তির আগ্রাসন তা যুগের প্রেক্ষিতে নব নব রুপে শুভ শক্তিকে কুক্ষিগত করতে চায়-যা থেকে মুক্তির পথ হয়তো লেখকেরও জানা নেই।

.....তবে এ মুক্তি দুদিনের। অন্য কোনও কায়দায় সেই হাজার হাজার টাকার দাবি চন্ডিবাবু করবেই করবে। তখন? তখন?[১০]

সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন নিরীক্ষপ্রবণ লেখক। প্রতীকের ব্যবহার তাঁর গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় সফলভাবে প্রয়োগ করতে দেখা যায়। 'পূর্ণিমায় বেচাকেনা' এ গল্পটি এ ধরনের গল্পগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। মানুষ যে ক্রমাগত নিজেকে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত করতে চাইছে আর সে কারণে নিজের অজান্তে যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে, মানবিক বোধ, চিন্তাশক্তি হারিয়ে কেবলি যন্ত্রের মতো আধুনিক জীবনের কামনা করছে তা যেন এ গল্পের প্রধান চরিত্র ঔষুধ বিক্রেতা টির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। যার সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকাটাই হুমকির সম্মুখীন, যার নিজের খাবার পয়সা নেই অথচ এক আগন্তুক তাকে কিছু অচেনা যন্ত্র দেখিয়ে তা কিনতে উদ্বুদ্ধ করে। ঔষধ বিক্রেতা কিন্তু যে সব যন্ত্রের ব্যবহার বা কার্যকারিতা জানে না। কোনো এক অদ্ভূত টান সে অনুভব করে যন্ত্রগুলোর প্রতি ফলশ্রুতিতে সামান্য যে অর্থ তার কাছে থাকে সেটাও সে নির্দ্বিধায় দিয়ে দেয় যন্ত্রটিকে পেতে। এ যেন অন্ধের মত আধুনিকতার পেছনে, নগর জীবনের যান্ত্রিকতার পেছনে মানুষের উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলাকে প্রতীকায়িত করে। পক্ষান্তরে প্রতীকী এই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক সংকটকেও লেখক তুলে ধরেছেন। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছে। এমনকি নিজের স্ত্রীকেও বিক্রি করে দিতে দ্বিধা করছে না। যান্ত্রিকতার প্রতি মানুষের এই অন্ধ মোহ লেখক তাঁর সুনিপুন লেখনীর দক্ষতা দিয়ে তুলে ধরেছেন এ গল্পে-

দশটা টাকা হবে না? কোথাও এত সস্তায় পাবেন না, স্যার।

.....এখন এই তো অবস্থা। ঘরের জিনিস বিক্রি না করে আর উপায় নেই,স্যার।[১১]

আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনে সফলতা যে কোনো মানুষের সামাজিক মর্যাদার চাবিকাঠি বলে মনে করা হয়। যে ব্যক্তি যত সফল সমাজ-পরিবার-বন্ধু মহল সকলে তাকে তত বেশি গুরুত্ব দেয় সম্মান করে। তেমনি 'স্বপ্নের ভেতরে বসবাস' গল্পে বেকার যুবক বাদশা। বেকারত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে সেও পরিবার বন্ধুমহলে সকলের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু একটি মিথ্যা উচ্চারণ তার চারপাশকে ম্যাজিকের মত বদলে দেয়। সে একদিন বলে ফেলে 'আমি যাচ্ছি'। ধীরে ধীরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বাদশা মিডলইষ্টে যাবে। এরপর থেকে তার জীবনটা বদলে যায়। তার পরিবার তার বন্ধুমহলে এমনকি তার পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির কাছেও বাদশার গুরুত্ব বেড়ে যায়। যে জীবনের স্বপ্ন সে দেখেছে একটি মিথ্যা তাকে সেই স্বপ্নের আস্বাদ জোগাতে থাকে। একটি ঘোরের মধ্যে তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে যা বাদশা ভীষণভাবে উপভোগ করছে। বেকারত্বের অভিশাপ কিছুদিনের জন্য হলেও সে মুক্তি পায়। এ গল্পের ভেতর দিয়ে লেখক সমাজে বেকারত্বের যে যন্ত্রণা তা অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন-

.....বহুদিন থেকে সে বেকার,....বহুদিন থেকে সে গঞ্জনা শুনেছে বাড়ির; সে দেখেছে আড্ডার বন্ধুদের একে একে খসে পড়তে, বিয়ে করতে, কাজ করতে, অন্য শহরে চলে যেতে। আজ সকালে বাবা তার দিকে কাঁসার গেলাশ ছুড়ে না মারলে, আর সেই সঙ্গে ওই কুৎসিত প্রবাদটা না বললে সে কি চায়ের দোকানে গুম হয়ে বসে থেকে, অবশেষে মরিয়া হয়ে 'আমি যাচ্ছি' উচ্চারণ করত?[১২]

রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশ যে কোনো সচেতন লেখককে প্রভাবিত করে। ফলে শিল্প সাহিত্যে রাজনীতি বা প্রচলিত সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনার অবতারণা অস্বাভাবিক বিষয় নয়, সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন রাজনীতি সচেতন সাহিত্যিক। তাই ব্রিটিশ শাসিত বাংলা থেকে আজকের বাংলাদেশের নানা রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত তারঁ রচনা এসেছে কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে তেমনি 'ব্রিটিশ আমলে কৃষক আন্দোলনের কর্মী দেবেশ বকশির লাশ নিয়ে 'নেপেন দারোগার দায়ভার' গল্পটি রচিত হয়েছে'[১৩]। এ গল্পে হিন্দু সম্প্রদায়ের জাত-পাতের বিভেদ তথা সংখ্যালঘু হিন্দুবর্ণের সমস্যা এবং তাদের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অবহেলার চিত্র চিত্রিত হয়েছে। পাশাপাশি বিট্রিশ শাসনাধীন বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক বাস্তব পরিবেশ লেখক উপস্থাপন করেছেন গল্পের পটভূমিতে। গল্পে নেপেন দারোগার দায়িত্ব পড়ে বিট্রিশ বিরোধী কৃষক আন্দোলনের নেতা দেবেশ বকশির লাশ-দাহ করার। কিন্তু দেবেশ বকশির মৃত্যুর সংবাদে ভীত হয়ে গ্রামবাসী পালিয়ে যায়। ফলে দেবেশ বকশি সেপাই ও বেহারাদের নিয়ে কিভাবে সে লাশ দাহ করে তা এ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। মূলত এ গল্পে ডোম বেহারা সেপাই ইত্যাদি নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনযাত্রা ও তাদের সামগ্রিক জীবনপ্রবণতা এ গল্পের উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। ইংরেজদের অমানুষিক নির্যাতন নেটিভদের ওপর অকথ্য অত্যাচার এ গল্পের প্রধান অনুষঙ্গ-

ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে আছে 'ছো। বিড়বিড় করে ওঠে নেপেন দারোগা। হাজতে দুটো রামডলা খেয়েই লীলাসাঙ্গ। এখন ঠ্যালা সামলাতে হচ্ছে তাকে।[১৪]

আধুনিকতার বেড়াজালে জড়িয়ে মানুষ হয়ে উঠছে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। এই আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে অবিশ্বাসী করে তুলছে। মানুষের মন থেকে বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর 'মানুষ' গল্পটি মানুষের বিশ্বাসহীনতা পটভূমিকায় রচনা করেছেন।এ গল্পে দুটি চরিত্রকে আমরা দেখি যারা দু' জন দুজনের শত্রু। একজন আরেকজনকে শত্রুতা করে জেলে ঢুকিয়ে ছিল। কিন্তু ভাগ্য তাদের একদিন প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এক সময় প্রচন্ড ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহা থাকলেও ওই দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শত্রুকে ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু শত্রুটি তা বুঝতে না পেরে ঝড়ের মধ্যেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে লোকটিকে বিশ্বাস করতে না পারার কারণে। যেখানে ঝড়, বন্যা, বা তদ্রূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা দেখি মানুষ ও পশুপাখিকে একই আশ্রয়ে আশ্রয় নিতে, পরস্পরকে বিশ্বাস করতে , সেখানে এ গল্পে আমরা দেখি মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যান্ত্রিক পৃথিবীতে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতা নৈঃসঙ্গিকতা মানুষকে মানুষের প্রতি আস্থাহীন করে তুলছে। গল্পের শেষে জেল ফেরত লোকটির দীর্ঘশ্বাসে তাই জীবনের চরম সত্যটি দক্ষতার সাথে লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন-

আমি তো মানুষ তাই সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারল না।[১৫]

প্রিয়জন হারানোর বেদনা সবসময় মানুষকে স্মৃতিকাতর করে তোলে। তবে স্মৃতিও একসময় ধূসর হয়ে যায় সময়ের স্রোতে, বাস্তবতায়। বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন ব্যস্ততা মানুষকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। যদি মানুষের মনে তার প্রিয় হারানোর অনুভূতি ম্লান না হতো তবে জীবনের স্বাভাবিক গতি থেমে যেত। নতুন করে বাঁচার সাধ হারিয়ে যেত। 'যুগল যুবনাশ্ব' গল্পটিও তেমনি বাস্তবতার নিরীখে দুজন মানুষের হারানোর স্মৃতি ভুলে নতুন করে বাঁচার আখ্যান। যেখানে হাফিজ ও সখিনা নামের দুজন মানুষ তাদের স্ত্রী ও স্বামীকে হারিয়ে গোরস্থানে আসে নিয়মিত কবরের পরিচর্যা করতে। সদ্য প্রয়াত প্রিয়জনের স্মৃতি তাদেরকে কষ্ট দেয় আর সে কষ্টকে লাঘব করতে

তারা ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাদের প্রিয়দের কবরের কাছে আসে। ভাগ্যের খেলায় একদিন ধীরে ধীরে তারা তাদের পরস্পরের দুঃখকে ভাগ করে নিতে বিবাহের মাধ্যমে নতুন করে জীবন শুরু করে। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই কঠিন। আর তাই যে কষ্ট ও স্মৃতিকাতরতা একদিন দুজনকে এক করেছিল সেই স্মৃতিও তাদের কাছে পান্ডুর, বিবর্ণ হয়ে যায়। সেই অনুভূতি তাদের কাছে কেবল কর্তব্য এবং শুধুই কর্তব্য হয়ে পড়ে। মানষের মনের এই অদ্ভূত অথচ নির্মম বাস্তব অবস্থাটিকে লেখক হালকা শ্লেষের সুরে বর্ণনা করেছেন উক্ত গল্পটিতে।

অগ্নিতে সমর্পিত তাম্রখন্ডের মতো বাস্তবতায় তারা, পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে, স্পর্ধিত তরুণ স্বাস্থ্যে যুগল যুবনাশ্বের মতো স্মৃতির বিপরীতে ধাবিত হয়ে যায়, এবং জীবনের প্রবাহমান তরল তাম্রের ভেতরে সখিনা কখনও হাফিজকে এবং হাফিজ কখনও সখিনাকে ঈষৎ বিরক্তিসহ বলে ওঠে, 'বনানীতে তোমার কিন্তু একবার যাওয়া দরকার।' গোরস্থানও এভাবে বনানী হয়ে যায়।[১৬]

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে প্ররোচনা চালিয়ে এদেশের সরল নিরীহ বাঙালীর মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে তাদের মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। সৈয়দ শামসুল হক এই সামাজিক বাস্তবতার চিত্রটি 'আরো একজন' নামক গল্পে শিল্পিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একুশে ফেব্রয়ারী অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ দিন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ফুল দিয়ে বরণ করে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে সেই শহীদদের যারা মায়ের ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ গল্পে এই ফুল দেওয়াকে কেন্দ্র করে জলেশ্বরীর হযরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজারের খাদেম ফতোয়া জারি করে যে, শহীদ মিনারে ফুল দেয়া পূজার সামিল। আর যে তা করবে সে দোজখবাসী হবে। তাকে সত্তর হাজার সাপ দংশন করবে ইত্যাদি নানা ভীতি দেখাতে থাকে। কিন্তু জলেশ্বরীর সাধারণ অশিক্ষিত একজন লোক কাসিমুদ্দি এর প্রতিবাদ করে ও ঢাকায় যায় মিনারে ফুল দিতে। কিন্তু জাদুঘরে বেড়াতে গিয়ে সে তার বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত একটি মুদ্রার সন্ধান পায়।সে সেটা নিতে চিৎকার করলে দারোয়ান তাকে জোর পূর্বক বের করে দেয়। উন্মত্ত কাসিমুদ্দি চলন্ত গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা যায়। সম্পূর্ণ কাকতালিয় ঘটনাটিকে মাজারের খাদেম মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য প্রচার করে।

শহীদ মিনারে গিয়েছিল কাসিমুদ্দি। ফূল দিয়েছিল, আল্লাহ তাকে মাফ করে নাই, সাথে সাথে উঠায়া নিছে।হেই মুসলমান সাবধান, সাবধান, সাবধান। [১৭]

তবে লেখক এ গল্পে গল্প কথকের মুখে অশিক্ষিত ধর্মান্ধ মানুষকে এই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচিয়েছেন। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ শহীদ মিনারে ফুল দিতে যায় তাদের প্রত্যেকে সুস্থ দেহে বাড়ি ফিরে যায়। কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা কখনো চিরন্তন হতে পারে না। অথচ ধর্ম ব্যবসায়ী ফতোয়া বাজেরা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকেই চিরন্তন বলে মানুষকে ভুল বোঝাতে চায়।

মূলত সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর বাংলা সাহিত্য দুটি ধারার প্রবাহ লক্ষ করা যায়। অবিভক্ত বাংলায় পাকিস্তান অংশে বাঙালী মুসলমানগণ এক নবতর সাহিত্যচর্চা শূরু করেন, অপরপক্ষে বাংলার সাহিত্যিকরা কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চা ছেড়ে ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। এই ধারাটি বাংলাদেশের সাহিত্য নামে পরিচিতি লাভ করে।তখন অনেক খ্যাতিমান পূর্ববাংলার সাহিত্যকেরা এই নতুন ধারায় সম্পৃক্ত হন। তন্মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক অন্যতম। তিনি পঞ্চাশের দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত সাহিত্যর প্রায় প্রতিটি শাখায় কাজ করার পাশাপাশি গল্প লিখে চলেছেন। সৈয়দ শামসুল হক সময়কে ধারণ করেছেন, সময়ের পরিবর্তনকে যুক্ত করেছেন তাঁর গল্পে। সৈয়দ হক নিরীক্ষাধর্মী লেখক। গল্পে রচনায় ও তিনি এর পরিচয় দিয়েছেন। আর সে কারণে তিনি সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে ছিলেন স্বতন্ত্র। পারিবারিক জীবনের গল্প থেকে শুরু করে আধুনিক মানুষের জীবন জটিলতা, মনোদৈহিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় নিম্নবিত্তের মানুষের বিপর্যয় ইত্যাদি অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে তার ছোটগল্পে। ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক জীবনবাদী গল্পকার।

তথ্য নিদেশ:

১. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', "শীত বিকেল", আহমাদ মোস্তফা কামাল (সম্পা), বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ২১ ।

২. সৈয়দ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯ ।

৩. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', "তাস", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩ ।

৪. সৈয়দ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০ ।

৫. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' , "ফিরে আসে", প্রাগুক্ত, পৃ . ৬২ ।

৬. মোস্তফা তারিকুল আহসান, 'সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম', "ছোটগল্প", বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৪১৫।

৭. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'আনন্দের মৃত্যু', আহমাদ মোস্তফা কামাল (সম্পা), বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র , ঢাকা, পৃ. ৮০ ।

৮. সৈয়দ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৯. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', "কালা মাঝি চড়নদার", প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০ ।

১০. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', "প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান", প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬ ।

১১. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', "পূণিমায় বেচাকেনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩ ।

১২. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', "স্বপ্নের ভেতরে বসবাস", প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬ ।

১৩. মোস্তফা তারিকুল আহসান , প্রাগুক্ত ,পৃ .৪১২ ।

১৪. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' "নেপেন দারোগার দায়ভার", প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩ ।

১৫. সৈয়দ শামসুল হক,'শ্রেষ্ঠ গল্প', "মানুষ", প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬ ।

১৬. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' , "যুগল যুবনাশ্ব", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩ ।

১৭. সৈয়দ শামসুল হক, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', "আরো একজন", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০ ।